MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
রেজি. নং ডিএ ১৩২৬ : ২১তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০২৩
দাম : দশ টাকা

শাসকদের মুখে উন্নয়ন; জনগণের বুকে চেপে বসা দুঃশাসন

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, গ্যাস-বিদ্যুতের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি, রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের নানামুখী প্রভাব, দেশের অভ্যন্তরে চলমান দুঃশাসন, দমন-

পীড়ন ও রাজনৈতিক, সামাজিক অস্থিরতায় এক দমবন্ধ অবস্থা গোটা সমাজজুড়ে বিরাজ করছে। ২০২২ সালে সারা দেশে ৪৭৯টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৭০ জন। আহত হন ৬ হাজার ৯১৪ জন। বন্দুকযুদ্ধ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। অপহরণ, গুম ও নিখোঁজ হয়েছেন পাঁচজন। নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ১ হাজার ৬৯৪টি। খুন হয়েছেন ১২৬ নারী। ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৯৩৬ জন। অ্যাসিড-সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন ১২ জন নারী। শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ১ হাজার ৪৫টি। এ ধরনের ঘটনায় নিহত হয়েছে ৪৭৪ শিশু। সীমান্তে হত্যার শিকার হয়েছেন ২১ জন। গণপিটুনিতে মারা গেছেন ৩৬ জন। কারা হেফাজতে মৃত্যু হয়েছে ৬৫ জনের। এ ছাড়া ২০২২ সালে সংখ্যালঘুদের ওপর ১২টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। ২১০ জন সাংবাদিক নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন।

২০২৩ সালে দেশের রাজনীতি-অর্থনীতি, শাসন-প্রশাসন ব্যবস্থা কোন দিকে পরিচালিত হবে এসব নিয়ে মানুষ ভীষণ উদ্বিগ্ন। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর উপর চলছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক দমন-পীড়ন। শাসকরা দলীয় সন্ত্রাসী বাহিনীকে নিয়ে অন্যান্যদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে হামলা চালাচ্ছে এবং রাজপথে পাহারা বসিয়ে হুঙ্কার দিয়ে চলছে। রাষ্ট্রের পুলিশকে দলীয় বাহিনী হিসাবে ব্যবহার করছে ক্ষমতাসীনরা। মুক্তিযুদ্ধের ৫১ বছর পর দেশে সভা-সমাবেশ, মিছিল করতে হয় পুলিশের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে। এটা স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক দল ও জনগণের জন্য দুঃখজনক ও লজ্জার বিষয়। সভা-সমাবেশ করা রাজনৈতিক দল তথা জনগণের সাংবিধানিক অধিকার। পুলিশ তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের সীমালংঘন করে গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে।

বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে সরকার চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীরা। মানুষ খাদ্যর তালিকা থেকে অনেক কিছু বাদ দিতে বাধ্য হচ্ছে। দেশে দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার অযৌক্তিকভাবে জ্বালানি, বিদ্যুৎ-গ্যাস, পানির দাম বাড়িয়ে চলছে। সরকার প্রধান বলছেন, গ্যাস-বিদ্যুতের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে হলে এর প্রকৃত দাম জনগণকে পরিশোধ করতে হবে! সরকার এই খাতে আর ভর্তুকি দিতে পারবে না। মানুষ কাজ হারিয়েছে, শ্রমিকের মজুরি কমে গিয়েছে। সার-বীজ, সেচসহ কৃষি উপকরণের দাম বৃদ্ধিতে কৃষক অসহায় হয়ে পড়েছে।

সরকারি দলের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী, এমপিরা–বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের নিয়ে জোকারের মতো ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছে, অশোভন–কটুক্তি করে রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে কলুষিত করছে। উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে বিরোধীদের সম্পর্কে দলীয় কর্মীদের মধ্যে বিদ্বেষমূলক মনোভাব তৈরি করছে। উপরন্তু ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, বিরোধীদের সব কর্মসূচিতে ক্ষমতাসীন দল রাজ পথে থাকবে, তাদের মোকাবিলা করা হবে। কেন এই হুমকি? রাজনৈতিক দলগুলো রাজপথে তাদের দাবিদাওয়া তুলে ধরবে, আদর্শ প্রচার করবে, দলীয় কর্মসূচি ও পরিকল্পনা মানুষের সামনে তুলে ধরবে। তা না করে কেন তারা রাস্তায় রাস্তায় দলীয় সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে সভা-সমাবেশ করার গণতান্ত্রিক অধিকারে বাধা দিবে? আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে দেশকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তারা জনগণের ওপর, দলের আদর্শের ওপর ও তাদের ক্রিয়াকর্মের ওপর ভরসা না রেখে পেশিশক্তির উপর নির্ভর করছে।

চার বছর আগে ২০১৮ সালে ৩০ ডিসেম্বর মানুষ রাতে যখন গভীর ঘুমে তখন সরকার দিনের ভোট রাতেই সম্পন্ন করে 'নিশিভোটের' এক কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করেছে। ভোট মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, নিজেদের পছন্দমতো প্রতিনিধি নির্বাচিত করে তাদের পক্ষে দেশ পরিচালনা করতে কিন্তু আওয়ামী লীগ ভোট ডাকাতি করে ক্ষমতা দখল করায় দেশ পরিচালনার এই সরকারের কোন নৈতিক ভিত্তি নাই, এই সংসদও অবৈধ। বাম গণতান্ত্রিক জোট ৩০ ডিসেম্বরকে 'কালো দিবস' হিসাবে পালন, সংসদ ভেঙে দেয়া, অবৈধ সরকারের পদত্যাগ, নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন ও ভাতের অধিকারের দাবিতে সভা-সমাবেশ করছিল, তখন পুলিশ নারায়ণগঞ্জসহ বিভিন্ন স্থানে

বাধা দেয়। রাজধানীর সুত্রাপুরসহ বিভিন্ন স্থানে সরকার দলের কর্মীরা বাম জোটের নেতৃবৃন্দের ওপর হামলা চালিয়ে আহত করেছে, সমাবেশ পণ্ড করে, ব্যানার কেড়ে নিয়েছে।

পুলিশ-র‍্যাব, বিজিবি, সেনাবাহিনী হচ্ছে প্রজাতন্ত্রের সেবক–জনগণের ট্যাক্সের টাকায় এদের বেতন হয়, তারা প্রজাতন্ত্রের বাহিনী না হয়ে এখন দলীয় বাহিনী হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, নৈরাজ্য-সহিংসতা দেখার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ও সরকারের। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের এই দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। তারা গায়ে পড়ে ঝগড়া করার চেষ্টা করছে। সরকারের পায়ের নিচে মাটি নাই, তাই ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে তদারকি সরকারের অধীনে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন করার সাহস দেখাতে পারে না।

সরকার মিথ্যা নাটক সাজিয়ে পরিস্থিতি উত্তরণের চেষ্টা করছে। প্রধানমন্ত্রী ২০১৮ সালে নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলোকে সংলাপের ডেকে বলেছিলেন, আমার প্রতি আস্থা রাখেন, আমি একটা সুষ্ঠু ভোট দিব। তার প্রতিশ্রুত সুষ্ঠু ভোটের নমুনা দেশবাসী ২০১৮ দেখেছে। এখন এদের কোন কথা ও কাজের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস নাই।

এবারে সরকার ক্ষমতা ধরে রাখতে নতুন চক্রান্ত করছে। কারণ ২০১৪ এবং ২০১৮-এর মতো নির্বাচন জনগণ হতে দেবে না। আমরা নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার এবং সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি দাবি করছি। আমরা বলছি তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে, নির্বাচনে কালোটাকা, পেশিশক্তি, সাম্প্রদায়িকতা-আঞ্চলিকতা বন্ধ করতে হবে। তারা টাকার বস্তা নিয়ে নির্বাচনে নামবে আর জনগণের মাথা কিনে নেবেন। এই ধরণের নির্বাচনে জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটে না। আপনারা দেখেছেন ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন। এখানে সরকারি দল এককভাবে প্রার্থী দিয়েছে, তাতেই দেড়শ-র অধিক মানুষ খুন হয়েছে। নিজেরা নিজেরা খুনাখুনি করেছে। নির্বাচনে ভোটারের উপস্থিতি ক্রমাগত কমছে। কোন কোন আসনে ৬ থেকে ১০ শতাংশ ভোটার উপস্থিতি হয়েছে। সম্প্রতি রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে দেখা গেল সরকারি দলের প্রতি মানুষের সমর্থন নাই। তারা সরকারের সম্পত্তি, রাষ্ট্রের টাকা ব্যবহার করে তাদের প্রতি জনগণের সমর্থন দেখানোর প্রতিযোগিতায় নেমে সভা-সমাবেশ করছে বিভিন্ন জায়গায়।

স্বাধীনতার ৫১ বছর পেরিয়েছে একই সাথে হারিয়ে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা ছিল–সাম্যের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা হবে। এখন সাম্যের জায়গায় গড়ে উঠেছে বৈষম্যের পাহাড়। ভূমিহীনের সংখ্যা না কমে তা ক্রমাগত বাড়ছে। মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে আজও মানুষ বস্তিতে, রেল লাইনের ধারে মানবেতরভাবে জীবনযাপন করছে। বলা হয়েছে, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু সেটা সুদূর পরাহত। এর একটা উদাহরণ, সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন ১২ বছরে ৯৫ বার পেছাল। বলা হয়েছিল, সামাজিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা হবে কিন্তু তা প্রতিষ্ঠা হয়নি। মানুষের মৌলিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার শাসকরা কেড়ে নিচ্ছে।

শাসকরা প্রতিনিয়ত সংবিধান লংঘন করে দেশ পরিচালনা করছে কিন্তু নির্বাচন এলেই তারা তাদের সুবিধামতো একে ব্যবহার করছে। ১৯৭২ সালে দেশের সংবিধান প্রণীত হয়েছিল। তাতে অনেক অসম্পূর্ণতা থাকা সত্বেও যা লেখা ছিল শাসকরা তাও মানছে না। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এখন আমরা যখন নির্বাচনকালীন তদারকি সরকারের দাবি তুলেছি, তখন তারা বলে–সংবিধানের বাধ্যবাধকতা আছে, এর বাইরে যাওয়া যাবে না। অর্থাৎ সংবিধানের দোহাই দেওয়া হয়। কিন্তু তারা তো সংবিধান মানে না। যেমন, সংবিধানের ৭৭ নং অনুচ্ছেদে ন্যায়পাল সম্পর্কে বলা হয়েছে–পার্লামেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনার বা কর্মকর্তাই ন্যায়পাল। তিনি সরকার, মন্ত্রণালয়, সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান বা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের তদন্ত করেন। ১৯৮০ সালে ন্যায়পাল নিয়োগ ও তাঁর দায়িত্ব নির্ধারণ করে 'Ombudsman Act' প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ন্যায়পাল পদে কাউকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। তার মানে সংবিধান মোতাবেক আপনারা কাজ করছেন না। সংবিধানের ১৩ নং ধারায় লেখা আছে উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টনপ্রনালীসমূহের মালিকানা হবে ক. রাষ্ট্রীয় মালিকানা খ. সমবায়ী মালিকানা গ. ব্যক্তিগত মালিকানা। এখন সংবিধান লঙ্ঘন করে মুক্তবাজারি অর্থনীতি চালু করে ব্যক্তি মালিকানাকে এক নম্বরে নিয়ে এসেছে।

সংবিধানের ১৭ এর ক. ধারায় লেখা আছে–'একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য। এখন সাধারণভাবে তিন ধারা, এবং প্রাথমিক শিক্ষায় ১৩ ধারায় বিভক্ত। আমাদের সংবিধানে নাগরিকদের যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার বিষয়টি রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে বলা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত আইন করে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হয়নি। এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলারে বলা হয়েছে, ব্যাংক অফিস সহকারী, নিরাপত্তা প্রহরী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী এবং মেসেঞ্জাররা ন্যূনতম মজুরি হিসেবে ২৪ হাজার টাকা পাবেন। আমরা তথ্য-উপাত্ত ও যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছি গার্মেন্টসে ২৪ হাজার টাকার নিচে শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি হতে পারে না এবং অন্যান্য খাতে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ২০ হাজার টাকার নিচে হলে সেটা ন্যায্য হবে না, মনুষ্যোচিত হবে না। কেন এখন গার্মেন্টস শ্রমিকরা ৮ হাজার টাকা বেতন পাবে?

সংবিধান লেখা আছে, স্বাধীন দেশের পররাষ্ট্র নীতি হবে 'জোট নিরপেক্ষ' নীতি। অর্থাৎ, স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও উপনিবেশবাদ বিরোধী মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতির নীতি গ্রহণ করবে, কোনো সামরিক জোটে জড়াবে না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখন স্বাধীন রাষ্ট্র ইরাকে হামলা করে সে দেশের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে হত্যা করলো তার বিরুদ্ধে আমাদের সংসদে একটা নিন্দা প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয় না, লিবিয়ায় গাদ্দাফিকে যখন হত্যা করা হয় কিংবা সিরিয়ায় হামলার নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় না। অর্থাৎ সংবিধানে যা লেখা আছে তা শাসকরা মানেন না। সংবিধান দেশের নাগরিকদের জন্যে কিন্তু সংবিধানের জন্য জনগণ নয়। কাজেই জনগণের আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক সংবিধান হতে হবে। সরকার যতই টালবাহানা করুক তদারকি সরকার ছাড়া দেশে সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না এবং জনগণ মেনে নিবে না।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দেশে ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন চালাচ্ছে; আর তা আড়াল করতে উন্নয়নের ঢাক বাজাচ্ছে। সরকারকে তো উন্নয়নমূলক কাজ করতেই হবে। সে উন্নয়ন হতে হবে মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার উন্নয়ন, জীবনমানের উন্নয়ন, অবকাঠামোর উন্নয়ন। উন্নয়নের নামে প্রাণ-প্রকৃতি-সম্পদ, জনস্বাস্থ্য-বাস্তুসংস্থান, নদী-সমুদ্র-জলবায়ু ধ্বংস করে কোন উন্নয়ন হতে পারে না। বস্তুত কিছু ইট-পাথরের উন্নয়ন প্রকৃত উন্নয়ন না। এখন উন্নয়ন হচ্ছে ব্যাংকের হাজার হাজার কোটি টাকা মেরে দিয়ে গুটিকয়েক লুটপাটকারীর উন্নয়ন, সিন্ডিকেট ব্যাবসায়ী ও দেশের সম্পদ যারা পাচার করছে তাদের উন্নয়ন। শ্রমিক-কৃষক, নারী-শিশুর জীবনমানের উন্নয়ন হচ্ছে না।

আমাদের শ্রমিক-কৃষক যে সম্পদ সৃষ্টি করে; বিদেশে কর্মরত শ্রমিকরা যে রেমিটেন্স পাঠায়, দেশের জনগণ খাজনা-ট্যাক্স দেয়, সে টাকা দেশের জনগণের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। এ ছাড়া দেশ-বিদেশ থেকে যে ঋণ নেয়া হয়, সে ঋণ এবং ঋণের সুদও দেশের জনগণ পরিশোধ করে। তাই এই উন্নয়নের প্রকৃত দাবিদার দেশের জনগণ। জনগণকে বাদ দিয়ে কেউ উন্নয়নের দাবিদার হতে পারে না।

সেতু হলে উন্নয়ন হয় কিন্তু সেই সেতু দিয়ে কার গাড়ি চলবে?। গাড়ি চলবে ভারতের টাটা কোম্পানির, জাপানের মিতসুবিশি মোটরস ও টয়োটা কোম্পানির। সেই গাড়িতে পণ্য পরিবহন হবে চীনের, হংকংয়ের, তাইওয়ানের। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে একটা গাড়ি নির্মাণ কারখানা ছিল প্রগতি ইন্ডাস্ট্রি। সেটা বন্ধ করে দিয়েছেন। যদি আমাদের দেশের কাঁচামাল, গ্রাম থেকে জমি থেকে কারখানায় আসতো, সেগুলো পণ্য হিসাবে আবার আমাদের গ্রাম-গঞ্জের মানুষের কাছে যেতো তাতে দেশের উন্নয়ন হতো। এখন উন্নয়ন হবে বিদেশিদের। এই উন্নয়ন লুটপাটের উন্নয়ন, বৈষম্যের উন্নয়ন, দুর্নীতির উন্নয়ন।

সাশ্রয়ী গণপরিবহণ ব্যবস্থার পরিবর্তে ব্যয়বহুল যোগাযোগে সরকার বেশি আগ্রহী। পদ্মা সেতু ও মেট্রোরেল করা হয়েছে। কিন্তু মেট্রোরেলের ভাড়া সর্বনিম্ন ২০ টাকা আর প্রতি কিলোমিটারের ভাড়া ৫ টাকা। উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ১০০ টাকা। এটা সম্ভবত পৃথিবীর সর্বোচ্চ ভাড়ার মেট্রোরেল। অন্যান্য দেশের সাথে তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায়–

কলকাতায় ২০ কিলোমিটারের বেশি পথ যাওয়া যায় ২৫ রুপিতে (৩১ টাকা)।

লাহোরে ২৭ কিলোমিটার যাতায়াত করা যায় ৪০ রুপিতে (১৮ টাকা)।

জাকার্তায় মেট্রোরেল ও বিআরটিতে সমন্বিত কিলোমিটার প্রতি ভাড়া ২৫০ রুপিয়া (১ টাকা ৬৪ পয়সা)।

কুয়ালালামপুরে ৫০ রিঙ্গিত ব্যয় করে পুরো মাস মেট্রোরেল ও বাসে চলাচল করা যায়, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১ হাজার ১৬৩ টাকা। ফলে এই মেট্রোরেলে কার উন্নয়ন হয়েছে? এই উন্নয়ন কী শ্রমজীবী মানুষের কাজে লাগবে?

পরিবহনের সবচেয়ে সাশ্রয়ী খাত হচ্ছে নৌপথ। এক সময় ১৪ হাজার কিলোমিটার নৌপথ ছিল সেটা কমে এখন ৮ হাজার কিলোমিটার হয়েছে। আমাদের দেশে ১২০০ নদ-নদী ছিল এখন ২৩০টার বেশি নদীর হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। নদী দখল-দূষণ করে ধ্বংস করা হয়েছে। নৌপথ অবহেলা ও উপেক্ষার শিকার। দ্বিতীয় সাশ্রয়ী খাত হচ্ছে রেল। রেলের বরাদ্দ দফায় দফায় বাড়ছে, কিন্তু বাড়ছে না গতি ও কাঙ্ক্ষিত সেবার মান। রেলের উন্নয়নে প্রকল্প নেয়া হয় আর প্রকল্প হারিয়ে যায় অনিয়ম-দুর্নীতি, লুটপাট আর অদক্ষতার গহ্বরে। স্বাধীনতার পর আমাদের রেল লাইনের দৈর্ঘ্য বাড়েনি, টিকিটসংক্রান্ত জটিলতা কমেনি। সিগন্যাল সিস্টেমের ত্রুটি ও ক্রসিং-এ গার্ডের অভাবে দুর্ঘটনা ঘটছে। বিপুল ব্যয়ে কেনা হচ্ছে ত্রুটিযুক্ত ইঞ্জিন, বগি অথচ বাংলাদেশের পার্বতীপুরের রেলের প্রধান ও সর্ববৃহৎ লোকোমোটিভ কারখানা সৈয়দপুর, পাহাড়তলীর কারখানাও নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের অধিকাংশ সেতুই ব্রিটিশ আমলের। নড়বড়ে রেলপথ, ঝুঁকিপূর্ণ সেতু।

ভারত উজানে আন্তর্জাতিক নদীতে বাঁধ দিয়ে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। এর ফলে আমাদের নদীগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দেশ ধীরে ধীরে মরুকরণের পথে এগুচ্ছে। বাংলাদেশকে মরুভূমি বানানো হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সরকার সোচ্চার না। সরকার ভারতের কাছে নতজানু হয়ে দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিচ্ছে। কিশোরগঞ্জ হাওর অধ্যুষিত অঞ্চল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করে হাওরের মানুষ বেঁচে আছে। আগাম বন্যায় হাওরের ধান তলিয়ে যায়। বর্ষাকালে ঝড়, শিলাবৃষ্টি, বজ্রপাতে তাদের ঘরবাড়ি লন্ডভন্ড করে দেয়। হাওরের উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে হাওর উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়। বোর্ড কোন ভূমিকা না রাখতে পারার কারণে তা বিলুপ্ত করা হয়। পরবর্তীতে 'বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড' গঠন করা হয়। পরে বোর্ডকে 'অধিদপ্তর' করা হয়। বাস্তবে হাওরের উন্নয়ন বলতে এক দিকে কাগুজে উন্নয়ন অন্যদিকে অপরিকল্পিত উন্নয়ন। রাস্তা নির্মাণ, যা হাওরবাসীর জন্য মরণ ফাঁদ হয়ে দেখা দেয়।

বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর ৬৪ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়। সরকার বলছে, পাচার করা অর্থ যদি ৭ শতাংশ ট্যাক্স দেয় তা হলে সেটা বৈধ হয়ে যাবে। আপনারা ওই চুরির টাকা বৈধ করে দিবেন চোরকে সাজা দিবেন না। এই ঘোষণার পর এক টাকাও দেশে আসে নাই। প্রতিবছর কালোটাকা সাদা করছেন বাস্তবে কালোটাকা সাদা হয় না দুর্নীতি বাড়ে। লুটেরারা দেশের সম্পদ লুট করে বিদেশে টাকা পাচার করে সেখানে বাড়ি বানায় সম্পদ গড়ে। সুইস ব্যাংকে টাকা জমায়। পাকিস্তান আমলে দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করেছে ২২ পরিবার। তারা আমাদের সম্পদ লুণ্ঠন করে তাদের নিজ দেশে নিয়েছে। আর আমাদের দেশের এই লুটপাটকারীরা দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করে দেয়। এদের মধ্যে কোন দেশপ্রেম নেই। যদি মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে এখন যে আওয়ামী ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন চলছে তা হঠাতে হবে। মানুষের ভোট এবং ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে হবে।

আমরা ২০০ বছর ইংরেজ শাসনে পরাধীন ছিলাম। পাকিস্তান আমলে ২৩ বছর পরাধীন ছিলাম। কিন্তু এই জাতি কখনই পরাধীনতা মেনে নেয়নি, দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করেছে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৫৭ সালে যখন ক্ষমতা দখল করে তার ৬-৭ বছরের মাথায় বিদ্রোহ শুরু হয়। মজনু শাহ, দেবী চৌধুরানী, ভবানী পাঠকদের নেতৃত্বে যে আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে শুরু হয়েছিল, ইংরেজরা তার নাম দেয় সন্ন্যাস বিদ্রোহ, আসলে সেটা সন্ন্যাস বিদ্রোহ নয় সেটি ছিল কৃষক বিদ্রোহ। তারপর থেকে আন্দোলন সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি উপনিবেশিক শাসন বিরোধী প্রায় সোয়া দুই শত বছরে বাংলাদেশের এমন কোন জেলা জনপদ পাবেন না যেখানে গণমানুষের লড়াইয়ে ভূমি কাঁপেনি, রক্ত ঝরেনি। আদিবাসী জনগোষ্ঠী, সাঁওতাল, চাকমা-গারো,

বাঙালি সাধারণ শ্রমজীবী কৃষক, নারী, ছাত্র যুবক মিলে সংগ্রামের মহাকাব্য সৃষ্টি করেছে। আজ বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের সকল বুর্জোয়া শাসকরা সে ইতিহাসকে খণ্ডিত বিকৃত করেছে না হয় কুক্ষিগত করার চেষ্টায় রত রয়েছে।

১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে ছিল আওয়ামী লীগ, এ কথা ঠিক। কিন্তু আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের গণচেতনা, গণআকাঙ্ক্ষা ধারণ করে না। ঘোষিত অঙ্গীকার মানে না। সে জন্য জনগণের ক্ষমতায়নের গণতন্ত্রকে মাটিচাপা দিয়ে লুটেরা পুঁজিপতি শ্রেণির ক্ষমতায়নের মঞ্চ সাজিয়েছে। লুটপাটতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্রের নাটক এখানে মঞ্চস্থ হয়। বুর্জোয়া শ্রেণির পালাবদলের পালাকীর্তনের বদলে এখন একই বন্দনাবাদ্য ধ্বনিত হচ্ছে। তাই তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দোহাই দিয়ে বাস্তবে চেতনা বাণিজ্য করছে, কতৃত্ববাদী ফ্যাসিবাদী শাসনকে উন্নয়নের ব্যানারে আড়াল করতে চাইছে। ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে কী করছে? আমাদের দেশে বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ আছে, সে জন্য ধর্ম ফাউন্ডেশন করতে পারতো তা না করে করল ইসলামিক ফাউন্ডেশন। আরেক দল এসে সংবিধানে বিসমিল্লাহ যুক্ত করে দিল। মুসলমানদের কোরআন শরিফের পর প্রধান হাদিসের নাম বুখারি শরিফ। সেই মূল হাদিসের শুরুতে বিসমিল্লাহ নাই। নবীর মদিনা সনদের শুরুতে বিসমিল্লাহ নাই, বিদায় হজের ভাষণে বিসমিল্লাহ নাই। তাহলে সংবিধানে বিসমিল্লাহ কেন?

তারপর স্বৈরাচারী আরেক দল এসে করলো রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। রাষ্ট্রের আবার ধর্ম কী? এগুলো হলো মানুষের ধর্ম বিশ্বাস ও অনুভূতি নিয়ে প্রতারণা। ধর্মীয় অনভূতিতে সুড়সুড়ি দিয়ে মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়া। ফলে, জনগণকে নিয়ে যারা প্রতারণা করে, ভুল পথে পরিচালনা করে, ধোকা দেয়, তারা গণতান্ত্রিক শক্তি হয় না। এরা দেশের ও জনগণের ক্ষতি করে। এগুলো করার কারণে স্বাধীনতার ৫১ বছর পরে দেশের গণচেতনা ও গণসংস্কৃতির মান এত নিচে নেমেছে। ভালোর বদলে কে কতো খারাপ তা নিয়ে এরা পাল্টাপাল্টি করে। রাজনীতিকে খেলা বানিয়ে খেলা করে, এটা আর কতকাল? আমরা বারবার এগুলোর বিরুদ্ধে সতর্ক করেছি। রাজনীতিতে নীতি আদর্শের ঝান্ডাকে অমলিন রাখার চেষ্টা করছি, সীমিত সাধ্যে আন্দোলনের মাধ্যমে মোড় ফেরানোর চেষ্টা করছি।

শাসকরা এখন টাকা-পয়সা দিয়ে, ভয়ভীতি, লোভ-লালসা দেখিয়ে রাজনীতি করে। এরা ক্ষমতার গদি রক্ষার কিংবা গদিতে চড়ার চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র, সহিংসতা, জালজালিয়াতি, প্রচার প্রতিষ্ঠান কুক্ষিগত করা, সাম্রাজ্যবাদের আশীর্বাদপুষ্ট হওয়ার দৌড়ে লিপ্ত। এগুলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। আমরা আজকে এই যে সম্মেলন করছি এর জন্য আমরা জনগণের কাছে গিয়েছি, মানুষ আমাদের অর্থ দিয়েছে। আমরা এই ধরনের আয়োজন সম্পূর্ণ করেও কিছু টাকা উদ্বৃত্ত করার চেষ্টা করি। কারণ, দল চালানোর জন্য টাকা পাব কোথায়? জনগণের কাছ থেকে টাকা নিয়ে জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য আমরা রাজনীতি করি। জনগণের সাহায্য নিয়ে আমরা জনগণের দল, শক্তি গড়ে তুলি, সম্পদ সৃষ্টি করি। আর বুর্জোয়া পাতিবুর্জোয়া দলগুলি দেশি লুটেরা কিংবা বিদেশিদের কাছ থেকে টাকা খোঁজে।

এরা নিজেদের আখের গোছানোর পাশাপাশি এক এক গোষ্ঠীকে লুটপাট করার সুযোগ করে দিয়ে তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে দল চালায়, রাজনীতি করে। কীভাবে করে? চালের দাম যদি কৃত্রিমভাবে দশ টাকা বাড়িয়ে দেয়া যায়, তা হলে বছরে ২৫ হাজার কোটি টাকা জনগণের পকেট থেকে উড়ে যায় আর সিংহভাগ সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের পকেটে জমা হয়! এবার আপনারা দেখলেন ডিমের দাম বাড়িয়ে দিয়ে, এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা কয়েকটা কোম্পানি হাতিয়ে নিয়েছে। সিন্ডিকেট গড়ে তুলে ভোজ্য তেলের দাম বাড়িয়ে দিয়ে ৭ থেকে ৮ হাজার কোটি টাকা বাজার নিয়ন্ত্রণকারী ৫টা কোম্পানি মুনাফা করে নিয়েছে। একজন দিন মজুর সারাদিন পরিশ্রম করে ৫০০ টাকা রোজগার করতে পারে না। ওরা কৃত্রিম সংকট তৈরি করে ৫ থেকে ২০ হাজার কোটি টাকা এক মাসে পকেটে ঢুকায়। ওই হাজার হাজার কোটি টাকার একটা মোটা অংশ ক্ষমতাসীন দলকে ও কিছু বৃহৎ বুর্জোয়া দলসহ নানা বাক্সে দেয়। যাতে যে পার্টি ক্ষমতায় যাক ওরা যেন লুটপাট করতে পারে। সাধারণ মানুষ এটা সহজে বুঝতে পারে না।

এখন আবার তর্ক শুরু হয়েছে। আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, 'আমি ভারতে গিয়ে বলেছি, শেখ হাসিনাকে টিকিয়ে রাখতে হবে।' আরেক দল মার্কিনীদের সাহায্য চাইছে। ওই সাম্রাজ্যবাদীরা কেউই আমাদের মঙ্গল করার জন্য আসবে না। ভারত একটা আঞ্চলিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র। তারা এই উপমহাদেশে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। তারা তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আমাদের ব্যবহার করতে চাইছে। এখন অনেকেই বলবেন, ১৯৭১ সালে ভারত আমাদের সাহায্য করেছিল। কথাটা ঠিক। ভারত চেয়েছিল তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে দুর্বল করতে আর আমরা চেয়েছিলাম পাকিস্তানি উপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে মুক্ত হতে। এখানে সহমত ঘটেছিল কিন্তু ভারতীয় সৈন্যরা না আসলেও আমরা দেশ স্বাধীন করতে পারতাম। পাকিস্তানি বাহিনী অক্টোবর-নভেম্বর মাসে গ্রাম থেকে সব ক্যান্টনমেন্টের দিকে চলে যাচ্ছিল। পাকিস্তানিরাও চেয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী আসুক। কেন জানেন? কারণ, মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে দেশ স্বাধীন হলে ৯৬ হাজার সৈন্যের এক জনও বাঁচতো না। মানুষ এদের পিটিয়ে মেরে ফেলতো। কারণ, বাংলাদেশের মানুষ Geneva convention অনুসরণ করতো না। ভারতীয় সেনাবাহিনী আসলে জেনেভা কনভেনশন অনুসরণ করতে হবে। কনভেনশন অনুযায়ী আত্মসমর্পণকারী সৈন্যকে হত্যা করা যায় না। ভারতীয় সৈন্যরা আসার কারণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দেশে ফিরে যেতে পেরেছে। ভারতের জনগণের সাহায্য-সমর্থনের পেছনে ঐতিহাসিক মানবিক বিষয় ছিল। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরার জনগণের সবটা নিয়ে সহযোগিতামূলক ভূমিকা আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি। ভারতীয় শাসকেরা বলেছিল, তারা এবং আমরা মিলে মিত্রবাহিনী আমাদের স্বাধীনতার জন্য লড়ছি। কিন্তু আত্মসমর্পণের সময় বাংলাদেশের প্রধান সেনাপতি বা প্রতিনিধিত্বকারী কাউকে সমমর্যদায় রাখা হলো না। এতে গণযুদ্ধে স্বাধীন হওয়া একটা জাতির মর্যাদা হানি হয়।

আমাদের মন্ত্রীরা যে ভাষায় কথা বলছে, কোন মুখে বলে তারা জাতীয়তাবাদী। এটা কেমন জাতীয়তাবাদী? এরা জাতির মান-সম্মান সার্বভৌমত্ব আরেকজনের পায়ে জলাঞ্জলি দিয়ে কোন ধরনের জাতীয়তাবাদের কথা বলে? ১৯৭১ সালে আমেরিকা পাকিস্তানের পক্ষে সপ্তম নৌবহর পাঠানোর ঘোষণা দিলে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা শপথ নিয়েছিল, ভিয়েতনাম ১৪ বছর লড়াই করে দেশ স্বাধীন করেছে আমরা প্রয়োজনে ১১৪ বছর লড়াই করব কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের কাছে মাথা নত করবো না। এখন শাসকগোষ্ঠী তাদের কাছে মাথা নত করে তাদের কাছে ধরনা দিয়ে বেড়াচ্ছে। এইভাবে কি জনগণের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা যায়? যায় না। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন থাকে? থাকে না।

মালয়েশিয়ান এম্বাসেডর ঢাকায় প্রেস কনফারেন্স করে বলেছে, তিন হাজারের বেশি বাংলাদেশি সেখানে দ্বিতীয় বাড়ি করেছে। তাহলে কেন সরকার এদের খবর নেয় না? ১০ বড় দেশে প্রতিবছর প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকা পাচার হচ্ছে! এরা কারা? সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকে টাকা জমাচ্ছে কারা? কারা দেশের সম্পদ লুট করে বিদেশে পাচার করেছে। খালেদা জিয়ার ছেলে কোকো'র পাচার করা টাকা আনতে পেরেছেন–এগুলো আনেন না কেন? সংবিধানে লেখা আছে অনুপার্জিত আয় ভোগ করা যাবে না। এর মানে হচ্ছে, যদি কোন লোক সম্পদ উপার্জনের হিসাব দিতে না পারে তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে, তাকে সাজা দেওয়া হবে। তাহলে এই যে লক্ষ হাজার কোটি টাকা, যা পাচার হয়ে যাচ্ছে এ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা কবে হবে?

পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, তিনি কানাডায় গিয়ে ২৮ জন টাকা পাচারকারী বেগমপাড়ার মালিকের সন্ধান জেনেছেন, এর মধ্যে নাকি আমলারা বেশি। কিন্তু নাম প্রকাশ করছেন না কেন? আমেরিকা-ইংল্যান্ড, দুবাই-মালয়েশিয়ায় বহু পাড়া তৈরি হয়েছে। প্রকাশ করে ব্যবস্থা নেন না কেন? দুই একটা প্রকাশ পেলেও ব্যবস্থা নেন না কেন? কারণ এরাই এদের জ্ঞাতি, আত্মীয়জন কিংবা ক্ষমতার খুঁটি হয়ে থাকা পরিজন। চোরের সর্দারদের কাছে চোরের বিচার চেয়ে আর কতকাল কাটাবে জনগণ? আসলে এখন এই সর্দারকে চিরবিদায় দিয়ে জনগণের হাতে সর্দারি ক্ষমতা আনতে হবে, সে পথ রচনার কাজে মন দিতে হবে।

পদ্মা সেতু বানাতে খরচ হওয়ার কথা ছিল ১০ হাজার ১৬২ কোটি টাকা, সেটায় এখন ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি কেন খরচ হলো? যে রাস্তা ৪ লেন করতে ভারতের লাগে ১০ কোটি টাকা, চীন ১৩ কোটি, ইউরোপের লাগে ৩০ কোটি টাকা, বাংলাদেশে লাগে ৮০ কোটি থেকে ১১০ কোটি টাকা। আমাদের দেশের শ্রম সস্তা সেখানে তো আরও কম লাগার কথা। তার মানে উন্নয়নের নামে ১০০ টাকার কাজে ৬০ টাকা মেরে দেয়া হচ্ছে। ওই টাকা ভাগ-বাটোয়ারা করে একদল লোক খাচ্ছে। কিন্তু তাদের ধরা যাবে না ছোঁয়া যাবে না। এর সাথে এখন প্রশাসনকে যুক্ত করে ফেলেছে।

যে পুলিশ ১৯৭১ সালে রাজারবাগে হানাদারদের প্রতিহত করতে জীবন দিয়েছিল অর্থাৎ তারা পাকিস্তানিদের পক্ষে জনগণের বিপক্ষে কাজ করবে না, এজন্য জীবন দিয়েছিল। ওই পুলিশদের এখন স্বাধীন বাংলাদেশে গণনিপীড়নের দুর্নীতিবাজ বাহিনীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যরা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বের হয়ে এসেছিল, জনযুদ্ধে শামিল হয়েছিল, এখন তাদের ব্যবসায়ী বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে এদের চরিত্র নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যারা দেশের জন্য, জনগণের জন্য স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের জন্য, ন্যায়ের জন্য কাজ করবে তাদের দুর্নীতির মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে কেন? কারণ তারা জনসেবার বদলে লুটেরাদের সেবা করে নিজেরা লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করে ক্ষমতায় থাকতে চায়। এটার নাম গণতন্ত্র?

আমাদের সংবিধানের ২৬ ধারা থেকে ৪৭ ধারা পর্যন্ত হচ্ছে মৌলিক অধিকার। সংবিধানে বলা হয়েছে, এমন কোন আইন করা যাবে না, যেটা জনগণের মৌলিক অধিকারের বিরুদ্ধে যায়। আর ব্রিটিশ আমলের, পাকিস্তান আমলের যত আইন মৌলিক অধিকারের বিরুদ্ধে আছে সমস্ত আইন বাতিল হয়ে যাবে এবং স্বাধীন বাংলার মাটিতে এমন কোন আইন করা যাবে না, যা জনগণের অধিকারের বিরুদ্ধে যায়। এটা লেখা হয়েছিল ৭২ সালে। কিন্তু এক বছরের মাথায় এসে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী এনে তা উল্টে দেয়া হলো, অর্থাৎ সংসদ সদস্যের তিন ভাগের দুই ভাগ মিলে যদি কোন আইন পাশ করে তা যদি মৌলিক মানবিক অধিকারের বিপক্ষেও যায় তা কার্যকর থাকবে। কথার মারপ্যাচে সংবিধানের ১৪২ ধারায় তা কার্যকর রয়েছে। সেটার জোরে বিশেষ ক্ষমতা আইন, ৫৪ ধারা, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ অসংখ্য গণবিরোধী কালাকানুন জারি হয়েছে এবং তৈরি হচ্ছে। তাহলে কেমন গণতন্ত্র থাকলো আর! এটা নিয়ে যারা ক্ষমতায় আছে তারা তো কথা বলে না, যারা ক্ষমতায় যেতে চায় তারাও বলে না। কেন বলে না? এই বিধান কেন পারিবর্তন করেন না? আর বলেন, পুলিশ মারে–পুলিশের দোষ দিয়ে কী হবে। এই বিধান বলবৎ রাখলে তো মার খাইতে হবে। যদি এটা না করতেন–তাহলে বিশেষ ক্ষমতা আইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করতে পারতো না। ৫০ থেকে ৬০টা আইন আছে যেগুলো কালো আইন, গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার বিরোধী।

এই বিশেষ ক্ষমতা আইন ইংরেজ আমলে ছিল ইন্ডিয়ান সেফটি অ্যাক্ট। যেই আইনে মহাত্মা গান্ধি, জওহরলাল নেহেরু, সুভাষ বসুদের গ্রেপ্তার করেছে। পাকিস্তান আমলে হলো DEFENCE OF PAKISTAN RULES, ১৯৬৫. এই আইনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান থেকে শুরু করে মনিসিংসহ অসংখ্য রাজনৈতিক নেতাদের জেল খাটতে হয়েছে।

মন্ত্রী-এমপিদের কথার লাগাম নাই। সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে কথা বলার বদঅভ্যাস হয়ে গেছে। দেশের মানুষকে এরা গাধা-ঘোড়া মনে করেন। মনে করেন মানুষ কিছু বুঝে না। আর বুঝলেও কিছু করতে পারবে না। দেশে এখন শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকৃত লেখাপড়া নাই। টাকা যার শিক্ষা তার নীতি চলছে, একই নীতি স্বাস্থ্য সেবা, আইনি অধিকার, ন্যায় বিচার প্রাপ্তির সকল ক্ষেত্রে। জনগণ যত সম্পদহীন হচ্ছে, ততোই তাদের ক্ষমতা কমছে। জনগণের শ্রমে সৃষ্ট সম্পদ যত শোষক লুটেরাদের হাতে যাচ্ছে ততই তারা ক্ষমতাবান হয়ে উঠছে। ওদের পাহারাদার থাকছে সরকার।

বাংলাদেশে এখন ৮০ লক্ষাধিক লোক মাদকাসক্ত। আমাদের মনে রাখতে হবে শোষণ যত বাড়বে মানুষের মানসিক ভারসাম্য তত নষ্ট হবে। একটা নৌকা যদি একপাশে বেশি কাত হয়ে যায়, ভারসাম্য না থাকে তাহলে ডুবে যাবে। সমাজেও ধনী-গরিবের বৈষম্য বাড়লে পারিবারিক সম্পর্কে, ঘরে ঘরে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, রাস্তাঘাটে অশান্তি অরাজকতা, চুরি ডাকাতি, রাহাজানি খুনসহ অপরাধমূলক কার্যক্রম বাড়তে থাকবে। অপরাধ কী? অপরাধ হচ্ছে সমাজের অসংগতির ফলাফল। শুধু মামলা দিয়ে, পুলিশ দিয়ে এটা দূর করা যাবে না। স্বামী স্ত্রীর চোখ তুলে ফেলতেছে, ছেলে বাপকে হত্যা করছে, ভাই ভাইকে খুন করে ফেলতেছে। আত্মহত্যা-ধর্ষণের সংখ্যা বাড়ছে। পাকিস্তানিরা স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে হত্যা-খুন, ধর্ষণ-লুটপাট চালিয়েছে। হানাদার বাহিনী অসংখ্য যুদ্ধাপরাধ করেছে কিন্তু কোন শিশুকে ধর্ষণ করার নজির স্থাপন করে নাই, আর এখন এমন স্বাধীন বাংলাদেশ তৈরি করেছেন শিশুরা ধর্ষিত হয়। নয় মাসে কোনো স্বাধীনতাকামী বাঙালি, কোনো বাঙালিকে হত্যা করে নাই। স্বাধীনতাকামী বাঙালি কোন মানুষকে হত্যা করে নাই, ধর্ষণ করে নাই। ওই মানুষ কী আকাশ থেকে পড়েছিল। আর এখন স্বাধীন দেশে কথিত নির্বাচন করতে গিয়ে ১২০ জন মানুষ খুন হয়ে যায়।

এটা কী নির্বাচন না চর দখলের লড়াই? জনগণের সেবা করবেন? সেবা করতে গেলে তো মানুষ বিনয়ী হয়, নমনীয় হয়। যুদ্ধংদেহিভাব নিয়ে এসে বলবেন, সেবা করতে চাই, তা তো হবে না। এই ভাষা সংঘাতের, লুটেরাদের, দাঙ্গাবাজদের। মানুষ আপনাদের দেহের ভাষা দেখেই বুঝে সেবা করতে নয়, লুট করতে আসছেন! মানুষের মন জয় করতে নয়, ভোট কিনতে আসছে। ভোট কিনে জিতবে, সেটাকে পুঁজি করে সম্পদ বাড়াবে। এখন ভোট ব্যবসাকেও নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। তাই ভোটার ছাড়া ভোট হলেও কথিত জনপ্রতিনিধি হলেই সম্পদ বাড়ে। আজকে যারা হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক, খোঁজ নিয়ে দেখেন মুক্তিযুদ্ধে এদের অনেকের পরিবারের একটা লোকও স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করে নাই। এদের অনেকে পাকিস্তানের দালালি করেছে। যারা নেতৃত্বের দোহাই দেন তাদের বেশিরভাগ ভারতে অতিথির জীবন কাটিয়েছেন। যুদ্ধে জীবন দিল জনগণ স্বাধীন করল দেশ। আর দেশ দখলে নিল পাকিস্তানি ২২ পরিবারের বদলে শত শত বাঙালি পরিবার। আজ তাই দাবি উঠেছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ তাই জনগণের হাতে বাংলাদেশ ফিরিয়ে আনতে হবে।

বাসদ সকল বাম প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিকে সাথে নিয়ে শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের শক্তির উপর ভর করে মুক্তিযুদ্ধে প্রকাশিত গণআকাঙ্খা, গণচেতনা ও অঙ্গীকারের বাংলাদেশ তথা শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লড়াই করবে। আমরা আপনাদের সক্রিয় সমর্থন, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করি। বাসদকে শক্তিশালী করে নিজেরা শক্তিশালী হয়ে উঠুন। ইংরেজ তাড়িয়েছি, পাকিস্তানিদের তাড়িয়েছি অনেক সময় লেগেছে অনেক ত্যাগ-কষ্ট হলেও শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছি। এবারও দেশীয় লুটেরাদের পরাস্ত করতে সক্ষম হবো।

(দিনাজপুর, কিশোরগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার জেলায় বাসদের সম্মেলনে দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান ও সহ সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন প্রদত্ত বক্তব্যের সারসংক্ষেপ সম্পাদনা করে উপস্থাপন করা হল)।